সেকুলারিজম্ ও জওয়াহরলাল নেহরু*

আবু সয়ীদ আইয়ুব

ভারত রাষ্ট্রকে আমরা সেকুলার ব'লে থাকি এবং এক অর্থে কথাটা খুবই সত্য। আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে ধর্ম ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র বিশেষ কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দরুন যাতে কাউকে কোনো অসুবিধায় পড়তে না-হয় সে-বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে রিলিজাস লিবার্টি, তা পশ্চিমের প্রাগ্রসর দেশগুলির চেয়ে আমরা একটুও কম ভোগ করি না। তবু পাশ্চাত্য অর্থে আমাদের রাষ্ট্র পুরোপুরি সেকুলার নয়; অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়নি এখানে! হ'লে কি ভালো হ'তো? আমাদের সামাজিক প্রথাপদ্ধতিতে এমন অনেক-কিছু গলদ দেখতে পাওয়া যায় না যা এখনও সংস্কার-সাপেক্ষ অথচ যা এ-যাবৎ ধর্মেরই শাসন মেনে এসেছে এবং ধর্মের নাম করেই টিঁকে আছে এতোদিন। এ-সব ক্ষেত্রে জনকল্যাণার্থে হস্তক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হ'লেও রাষ্ট্র সেকুলারিজমের দোহাই পেড়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। উদাহরণত হিন্দু বিবাহ আইনের কথা বলা যেতে পারে। মুসলিম বিবাহ আইনেরও অনুরূপ সংশোধন অত্যাবশ্যক। প্রাচীন শাস্ত্র যা-ই বলুক, স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিবাহ আধুনিক নীতিবোধকে আঘাত করে। মনুসংহিতায়, শরিয়তে এবং প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই যেখানে নারী-পুরুষের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, মোমিন-কাফিরের, ক্রিশ্চান-হিদেনের কথা উঠেছে সেখানে সমদৃষ্টির অভাব দেখা যায়। আধুনিক রাষ্ট্র তো এই ধরনের অবিচারকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

এইসব কারণেই বোধহয় আমাদের সংবিধান-রচয়িতারা 'সেকুলার' শব্দটি আদৌ ব্যবহার করেননি। অন্য-একটি কারণও থাকতে পারে। তাঁদের মনে হয়তো ঐ-শব্দের সঙ্গে ধর্মবিরোধ বা ধর্মোচ্ছেদ জাতীয় কোনো অর্থ জড়িত ছিলো। থাকাটা আশ্চর্য নয়, কারণ উনিশ শতকের মধ্যভাগে যখন সেকুলার শব্দের বহুল প্রচার ঘটে তখন সে-শব্দ যে-দৃষ্টিভঙ্গি বহন ক'রে আনতো তা সর্বপ্রকার ধর্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিরোধী ছিলো। শুধু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র থেকে নয়, মানুষের সমগ্র জীবন থেকেই ধর্ম নামক ব্যাপারটা দূরে সরিয়ে দিতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলেন সেকুলারিজমের ধ্বজাধারীরা।

---

* 'জওয়াহর' শব্দটি 'জওহর'-এর বহুবচন। হিন্দী ও উর্দুতে তাঁর নাম জওয়াহরলাল; বাংলায় 'জওহরলাল'-এ রূপান্তরিত করার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

এ হেন সেকুলারিজম্ আমাদের দেশের মাটিতে শিকড় গাড়েনি কোনোদিন। গাড়া উচিত কিনা সে-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। মানবেন্দ্রনাথ রায় সেই অল্প-সংখ্যক ভারতবাসীদের চিন্তানায়ক যাঁরা এই চারা গাছটিকে মহীরূহ ক'রে তুলতে প্রযত্নবান। তাঁর ধারণা ছিলো যে, চিরাগত আধ্যাত্মিক ভাবধারার স্থলে সমুন্নত কোনো জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করতে না-পারলে এ-দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্ধার সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের কাছে যে-স্বাধীনতা তিনি প্রত্যাশা করতেন তা কেবল বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ বা প্রচার করার সাংবিধানিক রক্ষাকবচক নয়, বরঞ্চ ধর্মমাত্রের পরিব্যাপ্ত ঊর্ণাতন্তু থেকে নিজেকে এবং সকলকে মুক্ত করার মৌল অধিকার। আমাদের দার্শনিক রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের কাছে অবশ্য সেকুলারিজম্-এর অর্থ একেবারে ভিন্ন। কয়েক মাস পূর্বে তিনি একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, সেকুলারিজমের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। ২১ আগস্ট ১৯৬১ তারিখের বক্তৃতায় তিনি আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছিলেন : "আমি দৃঢ়কণ্ঠে জানাতে চাই যে, সেকুলারিজমের অর্থ রিলিজনের বিলোপ নয়; তার অর্থ আমরা সকল ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান। আমাদের রাষ্ট্র অবশ্য কোনো বিশেষ একটি ধর্মমতের সঙ্গে নিজেকে এক করতে চায়নি।" গান্ধিজীর সেকুলারিজম্ এই ভাবেরই বলিষ্ঠতর প্রকাশ। তিনি সকল ধর্মমতকে সত্য ব'লে মানতেন এবং সর্বান্তঃকরণে বলতে পেরেছিলেন, "আমি আমার নিজের ধর্মকে যতোখানি শ্রদ্ধা করি অন্য সব ধর্মকেও ঠিক ততোখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখি!"

গান্ধিজীর ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তির মধ্যে সেকুলারিজমের দুই প্রান্তবর্তী সংজ্ঞা পাওয়া যায়। জওয়াহরলাল নেহেরুর মত এই উভয় প্রান্তিক মত থেকে ভিন্ন। তিনি অবশ্য ধর্মের সাম্প্রদায়িক (বা তাঁর ভাষায় সংঘবদ্ধ) রূপের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। 'আত্মজীবনী'তে লিখছেন : "ধর্মের, অন্ততপক্ষে সংঘবদ্ধ ধর্মের (organised religion), যে-চেহারা ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র আমার চোখে পড়ে তা দেখে আমি শিউরে উঠি; একে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছি আমি অনেকবার। প্রায় সর্বত্র ধর্ম বলতে বোঝায় শাস্ত্র-বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, পশ্চাদ্‌গতি, সামাজিক শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণ।"

কিন্তু ভারতে মানবেন্দ্রনাথ কিংবা ইওরোপে মার্ক্স ও রাসেলের মতো মনীষীরা যে-ভুল করেছিলেন, জওয়াহরলাল সে-ভুল করেননি; অর্থাৎ ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কেবলমাত্র তার সংঘবদ্ধ রূপটাকেই চোখের সামনে রাখেননি। যদিও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সর্বনাশা শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতেই নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছিল, তবু যখন তিনি 'রিলিজন' শব্দের সংজ্ঞা-নির্ণয়ের প্রয়াস পেলেন তখন তার বিকট সাম্প্রদায়িক চেহারা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্যক্তির জীবনে তার যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেদিকেই তাকালেন : "রিলিজনের মতো বিবিধার্থযুক্ত শব্দ প্রয়োগে ভুল বোঝার

সম্ভাবনা আছে; তবু যদি কেউ প্রশ্ন করে রিলিজন কী, তবে উত্তরে আমি বলবো— সম্ভবত এর মূল কথাটি হচ্ছে মানুষের আত্মিক বিকাশ, এমন একদিকে তার অভিব্যক্তি যাকে পরম শ্রেয় জ্ঞান করা হয়।" উদ্ধৃতিটি 'আত্মজীবনী' থেকে। পরে 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে সেই দিকটার সম্বন্ধে আরও বিশদ করে তিনি বলছেন : "বাইরের দিকে যেমন আত্মরক্ষার জন্যই অগ্রগতির প্রয়োজন আছে, তেমনি আমরা পেতে চাই অন্তরের শান্তি, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের শান্ত সংযোগ। শুধুমাত্র শারীরিক সুখ ও বৈষয়িক চরিতার্থতা নয়, চাই মনের গভীরতলের সেইসব প্রেরণা ও উৎকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তি যা মানুষের চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে রেখেছে সভ্যযুগের প্রথম দিন থেকে, যেদিন সে তার দুঃখ-ক্লেশময় অসমসাহসিক যাত্রা শুরু করল কর্মক্ষেত্রে ও ভাবলোকে।"

নেহরুর মনের আধ্যাত্মিক গড়নটা আরো-একটু স্পষ্ট হয় যখন তিনি বলেন জীবনের সম্মুখীন হ'তে হবে "বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞান-নিষ্ঠ দর্শনের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, এবং এ-সবের অতীত যা-কিছু তার প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা মনে রেখে।" এই বিজ্ঞানোত্তীর্ণ যা-কিছু সে-বিষয়ে তিনি আরো বলছেন : "জগতের পানে যখন তাকাই তখন আমার মনে রহস্যের ছোঁয়া লাগে, অতল গভীরতার ছোঁয়া। এই রহস্যাবৃত জগৎকে বোঝবার জন্য মন আকুল হ'য়ে ওঠে, তার পূর্ণ স্বরূপটি উপলব্ধি করবার জন্য এবং তার অন্তর্নিহিত সুরের সঙ্গে আমার মনের সুরটি মেলাবার জন্য।" সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য নেহেরু যেন নিজেকেই সাবধান করে দেন যে, "একে বোঝবার প্রকৃষ্ট প্রণালী বৈজ্ঞানিকের নৈর্ব্যক্তিক ও তন্নিষ্ঠ বিচার-পদ্ধতি।" কিন্তু এটা কি স্পষ্ট নয় যে, বিজ্ঞানের পথ সেই অতল গভীর রহস্যের পূর্ণ স্বরূপটি উপলব্ধি করবার বা তার সুরে সুর মেলাবার পথ নয়? সে-পথটি আধ্যাত্মিক সাধনার পথ। তাই যদিচ নেহরু ব্যক্তিস্বরূপ-ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন, তবু আমি না-মনে ক'রে পারি না যে, তাঁর চিত্তের একটি গোপন কক্ষ ভক্তিভাবে না-হোক তারই সহোদর কোনো ভাবে ভরা ছিলো। উনিশ শতকী কালাপাহাড়ী সেকুলারিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারতেন বলেও আমার মনে হয় না।

এটা সত্য যে নেহরু বিশ্বাস করতেন আজকের দিনের প্রকৃত দ্বন্দ্ব হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে নয়, বরং উভয়ের সঙ্গে সর্বজয়ী বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-নির্ভর আধুনিক সভ্যতার। এই নবযুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে তিনি কতোখানি আগ্রহী ছিলেন তা-ও সুবিদিত। কিন্তু এ-সবের এমন অর্থ করলে ভুল হবে যে, নেহরুর মতো বিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে একান্ত আবদ্ধ যে-চিন্তা ও দৃষ্টি তা ধর্ম শব্দের অভিধাভুক্ত ভাব-বৈচিত্র্যের সম্পূর্ণতা বা যথোপযুক্ত পদাধিকারী হ'তে পারে। এ-কথার সমর্থনে আমি আরো একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই : "প্রগতি, আদর্শ, মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রেয়বোধ, মানবজাতির অনন্ত ভবিষ্যৎ— এ-সবের প্রতি আমাদের অপরাজেয় আস্থা কি

বিধাতার বিধানের প্রতি ভক্ত-মনের যে ঐকান্তিক নির্ভরতা তার খুব কাছাকাছি নয়? কিন্তু এই আস্থার যাথার্থ্য যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করতে গেলে গোড়াতেই বাধা পাই। অথচ আমাদের মনের গভীরে এমন-কিছু আছে যা— আশা ও আস্থাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, ছাড়লে যে জীবন এক রুক্ষ মরুভূমি হ'য়ে উঠবে।"

এমনি এক রুক্ষ মরুভূমির আভাস পাই আমরা একজন মহৎ কবির কাব্যে যাঁর জীবন উক্ত আশা ও আস্থা থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলো। জানি না নেহরু বোদ্‌লেয়রের কতোখানি গুণগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু তিনি হপকিন্সের কবিতা ভালোবাসতেন, বিশেষভাবে পছন্দ করতেন সেইসব কবিতা যেখানে ঐ ঋত্বিক কবির মন জগতের রূঢ় আঘাতে জর্জরিত ও আত্মদ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট হ'য়েও ঈশ্বরকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন করতে পেরেছে :

Wert thou my enemy,
O thou my friend.
How would'st thou worse.
I wonder, than thou dost
Defeat, thwart me?

ধর্মভাবের একটি অর্থ অনন্তের প্রতি রহস্য, বিস্ময়, আনন্দ ও শ্রদ্ধার ভাব। এই অর্থে নেহরুকে ধার্মিক না-বলে উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁর কালেজী শিক্ষা ছিলো বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মেজাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো ঘনিষ্ঠ; এবং তাঁর একান্তসাধনা ছিলো যে তাঁর দেশের মধ্যযুগীয় মন ঐ-মেজাজ ও পদ্ধতির সংস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হোক্, নবযুগধর্মে দীক্ষালাভ করুক। আধ্যাত্মিক প্রেরণা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এই শুভ সঙ্গম, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অতীত যা তার প্রতি গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মের শাস্ত্রমানা দলবদ্ধ রূপের বিরুদ্ধে উদ্দীপনাময় বিদ্রোহ— জওয়াহরলাল নেহরুর মনের এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। আমরা তাঁর কাছ থেকে যে বিরাট উত্তরাধিকার পেয়েছি তার মধ্যে এই মনটা সবচেয়ে মূল্যবান, আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়,— শুধু এ-দেশের পক্ষে নয়, সব দেশের পক্ষেই।

২

ভারতীয় সংবিধান পরিষৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শটাকেই বরণ করলেন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে মজবুত করা। কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধি একটা উল্টো বিপদ ডেকে আনতে পারে। জনগণ যখন তাঁদের সাংবিধানিক অধিকারের রাজনৈতিক প্রয়োগে ক্রমশ অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবেন তখন যে-সব বহু প্রাচীন পরম্পরাগত অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির দ্বারা গণচিত্ত অনেকাংশে আজও চালিত তার নানাবিধ রাষ্ট্রিক

প্রকাশের সম্ভাবনা কি দেখা দেবে না? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক প্রগতির সূত্রপাত উপরিতলেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু সে প্রগতি অচিরে রুদ্ধ হ'য়ে যাওয়া খুবই সম্ভব যদি-না নিম্নতলবর্তী লোকেদের মনে তা অনুকূল সাড়া জাগাতে পারে। নতুনযুগের আলোকপ্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক নেতৃবর্গ ও সুধীবৃন্দের মধ্যে যে সংস্কার-মুক্তি, পরমতসহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক উদারতা দেখা দিয়েছে তা যদি অধিকাংশের মধ্যে পরিশ্রুত না-হতে পারে, তবে অধিকাংশের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে সেকুলার রাষ্ট্রের সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলিকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

আমাদের সেকুলার গণতন্ত্রের ভিত গড়া হয়েছিলো ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে। আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি ও গর্ব ক'রে থাকি যে, সমস্ত আফ্রো-এশিয়াতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা সফল হয়েছে একমাত্র ভারতবর্ষেই (জাপানকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু ঐ 'হয়তো' পদটা যোগ করতে হয়)। তবু মনে-মনে আমরা সবাই জানি (এবং বিদেশী কেউ উপস্থিত না-থাকলে মুখেও মানি) যে, সেকুলার গণতন্ত্রের ইমারৎ তৈরি হয়েছে বটে কিন্তু ভিতটা এখনও কাঁচাই র'য়ে গেছে। তার প্রধান কারণ অশিক্ষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক বিচার বর্ণগত ও সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির দ্বারা অনেকটা আচ্ছন্ন, তাদের মনের উপর নানাপ্রকার গোঁড়ামি কুসংস্কারাদির প্রভাব প্রবল— এক কথায় সে-মন এখনও মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসেনি। শুধু জনসাধারণ কেন, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও শতকরা আশিজন আজও দিব্যি দুই নৌকোয় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন প্রভৃতির সময়ে মনে হয়েছিলো যেন আমাদের হাজার বছরের ঘুম অবশেষে ভাঙলো, অন্তত ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণীর চিত্ত নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত, নতুন ভাবের চিন্তার কর্মের অনুপ্রেরণায় বেগবান হ'য়ে উঠলো। কিন্তু সেটা স্বল্পকালের ব্যাপার। দু-তিন দশক পার না-হ'তেই উত্তাল স্বাদেশিকতার তোড়ে নবজাগরণের স্রোত গেল ঘুরে। নতুন যুগকে একেবারে বর্জন না-করলেও তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে আমরা চললাম মনু-পরাশর-জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমুখে। রবীন্দ্রনাথ, গোখলে, জওয়াহরলাল প্রভৃতি কতিপয় মনীষী এই উল্টো গতি ঠেকাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁদের সাফল্য সীমিতই রইলো। রেনেসাঁসকে কোণঠাসা করলো রিভাইভালিজম্; নবযুগের জন্য যে-আসন পাতা হয়েছিলো তাদের অনেকখানি জুড়ে বসলো প্রাচীন যুগের প্রেতচ্ছায়ারা। মুসলিম সমাজের অবস্থা তখন আরও শোচনীয়। সৈয়দ আহমদ ইসলাম ধর্মকে সাম্প্রদায়িক অন্ধ বিশ্বাসের স্তর থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তির সাবালক পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির উপর স্থাপিত করার যে শুভ প্রচেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন তা অচিরে রুদ্ধ হ'লো; গোঁড়ামির জগদ্দল পাথর নড়লো না। শেষ অবধি আবুল কালাম আজাদের মতো উদারবুদ্ধি ও গভীর জ্ঞানী মানুষকে হার মানতে হ'লো মুহম্মদ আলি জিন্নার মতো ইসলামী শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ব্যাপারে অননুরাগী ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কৌশলের কাছে।

সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমি বুঝি ধর্মের চেয়ে ধর্মসম্প্রদায়কে এবং ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠীকে বড়ো ক'রে দেখা। যে নিজেকে সবসময়ে হিন্দু বা মুসলমান ব'লে ভাবতে অভ্যস্ত, অন্যের সঙ্গে পরিচিত হলে তার চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ইত্যাদির খোঁজ না-নিয়ে প্রথমেই জানতে চায় লোকটি ব্রাহ্মণ না শূদ্র, হিন্দু না মুসলমান, ইহুদি না খ্রীষ্টান, সে সাম্প্রদায়িক মানুষ। এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শের সবচেয়ে বড়ো হন্তারক। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ইংরেজ সরকারের আদর-আপ্যায়নে পুষ্ট হ'য়ে দু-তিন দশক ধ'রে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অশুভ শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিলো। ইংরেজদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থান্বেষী দূরদর্শিতা আর হিন্দুদের অদূরদর্শিতার আপতিক দুর্যোগের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে ঐ আসুরিক শক্তি দেশের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হানলো তাতে ক'রে দেশ দু-খণ্ড হয়ে গেলো। খণ্ডিত ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার শিঙ ভেঙেছে কিন্তু মেরুদণ্ড ভাঙেনি এখনও। দুঃখের বিষয় এখনও সে আপন অনর্থপাতী ও আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেনি। 'হিন্দু মহাসভা' বা 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘে'র সোচ্চার হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা অবশ্য 'মুসলিম লীগ' মার্কা স্থূল সাম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া; কিন্তু সূক্ষ্ম, মোলায়েম ও মুদিতচক্ষু কতকটা অবচেতন, কতকটা অবগুণ্ঠিত, এক সাম্প্রদায়িকতা বহুকাল ধ'রেই বিদ্যমান রয়েছে এ-দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে।

মতামতের দিক থেকে হিন্দুরা খুবই সহিষ্ণু ও উদার সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁদের জাত্যভিমান তীব্র, নিজেদের বহু প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে গৌরববোধ প্রচণ্ড এবং যারা হিন্দু জাতির গণ্ডীর বাইরে তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য অবজ্ঞা বদ্ধমূল। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পি. ভি. রাজমন্নার আগস্ট ১৯৫৫ সালে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে অসংকোচে বলতে পেরেছিলেন যে তাঁর কাছে ভারতীয় সংস্কৃতি আর হিন্দু সংস্কৃতি শব্দদ্বয় অভিন্নার্থ। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি ও নেহরু অবশ্য হিন্দু সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহাপুরুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উদারশিক্ষা সত্ত্বেও খুব অল্পসংখ্যক হিন্দুই বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের কতকটা আরবী-ফার্সী উপাদান সংবলিত সংস্কৃতিও সুমহান ভারতীয় সংস্কৃতিধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ!* তবু উক্ত মহাপুরুষগণের প্রভাব এমনই চিত্তোন্মেষক এবং ব্যক্তিত্ব এতোই ভাস্বর ছিলো যে তার পরিণামে হিন্দুদের কতকটা 'রেশাল' বা জাতিগত সাম্প্রদায়িক (প্রতি তুলনায় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ডগমা-নির্ভর) কালক্রমে ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে ভারতীয় রাজনীতির নব-নব বিবর্তন-ধারায় বিলীন হ'য়ে যেতো— যদি-না সম্প্রতি হিন্দুদের মন অত্যন্ত তিক্ত হ'য়ে উঠতো পাকিস্তানের মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক নীতির এমন-কি পাকিস্তানের গ্লানিকর

---

* অধিকাংশ মুসলমান প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিকে আপন ব'লে মেনে নিতে পারেন না, এ-কথাটা আরো সত্য এবং আরো শোচনীয়। তবে আশার কথা এই যে, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মন ক্রমশ এ-সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠেছে।

জন্মবৃত্তান্তেরই অভিঘাতে। ফলত, যদিও আমাদের সংবিধান ঔদার্যে, পরমতসহিষ্ণুতায় ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচারে পৃথিবীর আদর্শস্থল, তবু তা এ-দেশে মাঝে-মাঝে সাম্প্রদায়িক হিংসাবৃত্তির বিস্ফোরণ ঠেকাতে পারেনি। ভারতের হিন্দুরা যে (এবং শুধু হিন্দুরাই কেন?) পাকিস্তানী হিন্দুদের প্রাণ, সম্মান বা গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত এলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশার শোধ তুলবেন ভারতের মুসলমানদের উপর এটাকে স্বাভাবিক বলা যায় না— যদি-না আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকি যে আমাদের সভ্যতায় ট্রাইবল্ যুগের কতকগুলো প্রতিহিংসা-মূলক উপাদান— ইংরেজিতে যাকে বলে ব্লাড ফিউড— এখনো বলবৎ আছে।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কে যাঁরা মৈত্রী কামনা করেন তাঁরা সম্মিলন ও সমন্বয়ের উদাহরণগুলি খুঁজে-খুঁজে বার করেন— সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে, সাধু-সন্ত ফকির-দরবেশ আউল-বাউলদের সাধনায়, আকবরের মতন মহান সম্রাটের দূরপ্রসারী উদার বুদ্ধির রাজকীয় প্রকাশে। যাঁরা বিরোধকেই বড়ো করতে বদ্ধপরিকর তাঁদের খুব বেশি বেগ পেতে হয় না সংঘর্ষ ও সংঘাতের দৃষ্টান্ত উদ্‌ঘাটন করতে। বিজয়োন্মত্ত ক্ষমতাগর্বিত মাহমুদ গজনবী, আলাউদ্দিন খল্‌জী, ঔরঙ্গজীব, নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ-র যে-সব দানবিক কীর্তি ক'রে গেছেন তা-ও ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত ক'রে আছে। কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারে ইতিহাসের উপর এতোটা নির্ভর করার প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করতে পারি না। ঐতিহাসিক কৌতূহল ভালো, জ্ঞানীগুণী ঐতিহাসিকের রচনা পাঠ ক'রে আনন্দ পাওয়াটা সঙ্গত। কিন্তু কোনো জাতি যদি তার ভবিষ্যৎ পন্থা খোঁজে ইতিহাসের পাতায়, তবে বলতেই হবে যে, এগিয়ে চলবার ইচ্ছা তার এখনও জন্মায়নি। ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট সম্পর্কে ইতিহাসও কম নৈরাশ্যজনক নয়, ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির গত একশো বছরের মধ্যে তিন-তিনবার যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, অনেক রক্তপাত, অনাচার অত্যাচারের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ঐ-সম্প্রদায় বা জাতিগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কি সেই কারণে চিরকালের মতো তিক্ত হ'য়ে থাকবে? ইতিহাসের দ্বারা আমরা অনেক সময়ে চালিত হই এটা সত্য কথা, কিন্তু গৌরবের কথা নয়। এই সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই মনুষ্যত্ব। সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে অতীতকে মাথায় ক'রে বুকে ধরে নয় অতীতকে পিছনে ফেলে, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে অতীত জেনেই।

ইতিহাস যা-ই বলুক, ভারতে ও পাকিস্তানে উভয় সম্প্রদায়ের অধিকসংখ্যক লোকের শিরায়-উপশিরায় ভেদবুদ্ধি এমন নিয়ত প্রবহমান যে যখন তা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারূপে ফেটে না-পড়ে তখনও তার নানাপ্রকার সূক্ষ্ম প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া দেখা যায়। উদাহরণগত আমরা সাম্প্রদায়িক উপদ্রবকে বন্যা-মহামারী জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুল্য জ্ঞান করি, তারই মতো বেদনাদায়ক কিন্তু তার চেয়ে বেশি ন্যক্কারজনক নয়। অল্প লোকই

উপলব্ধি করেন যে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতায় একটি অসহায় মানুষের প্রাণনাশ বন্যায় বা কলেরায় হাজারটি মৃত্যু অপেক্ষা অনেক বেশি মর্মন্তুদ ব্যাপার— কারণ প্রথমটি নৈতিক অধঃপতন, দ্বিতীয়টি প্রাকৃতিক বিপদ্‌পাত মাত্র। উইলিয়াম জেম্‌স্‌ ধর্ম বিষয়ে গভীর ও অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ধর্মবিশ্বাস-জনিত অধ্যাত্মশক্তি যেমন অনেককে জনসেবার প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনি আবার অনেককে সমাজকর্ম-বিমুখও করেছে। কিন্তু ধর্ম যখন এমনতরো বীভৎস বিরাট এক অমঙ্গলরূপে দেখা দেয় তখন ধর্মের সত্যতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে নতুন ক'রে ভাবতে হবে আমাদের। আমি এ-কথা মানতে প্রস্তুত নই যে, যে-রিলিজনের নামে নিধন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, গৃহদাহাদি সংঘটিত হয়েছে সম্প্রতি এবং হাজার-বছর ধ'রে হ'য়ে এসেছে ইউরোপ-এশিয়া জুড়ে— তা রিলিজনই নয়। রিলিজন তাকে বলতেই হবে, তা রিলিজনের একটি বিশেষ রূপ— তার সংঘবদ্ধ বা সাম্প্রদায়িক রূপ। একে যদি ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম বা সনাতন হিন্দুধর্মের সত্যরূপ না-বলতে চান তবে আমি আপত্তি করবো না। শুধু জিজ্ঞাসা করবো— খ্রীষ্টীয়, মুহম্মদীয় ও হিন্দুধর্মের সত্যরূপ কী; ভাষান্তরে, সত্য ধর্ম কাকে বলবো? মিথ্যা ধর্ম কী সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। একজন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় ধর্মসাধকের ভাষাতেই উত্তর দেবো এখানে। আধুনিক যুগের বিচারে রিলিজনের পরতে-পরতে যে বিরাট কলঙ্কের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে তা অনেকাংশে মেনে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "এ-কালিমার মূল কোথায় তা আমাদের দেখতে হবে। এর মূল ধর্মের সত্যপ্রকাশে নয়, আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা ও সাধনায় নয়; মূল খুঁজে পাওয়া যাবে বুদ্ধির আলোকে যেখানে রিলিজন ধূলিমলিন করেছে, মূঢ় ভ্রান্তিবিলাসে মগ্ন হ'য়ে নিজেকে এক ক'রে ফেলেছে বিশেষ একটি মতবিশ্বাস, সম্প্রদায়, আচার-অনুষ্ঠান বা সংস্থার সঙ্গে।"

এই মূঢ় বিভ্রম ('ignorant confusion') ইতিহাসের পাতা জুড়ে অযথা টিঁকে রয়েছে এবং অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছে যুগ-যুগ ধ'রে। এর জন্য কোটি-কোটি মানুষকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, অনেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। এরই উল্টো দিকটা আরও গ্লানিকর,— যারা ধর্মান্ধতা ও ধর্মবিদ্বেষের কবলে প'ড়ে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্তরে নেবে গেছে তাদের সংখ্যাও কম নয়।

ইউরোপে যদি এই তামসিকতারও অবসান ঘ'টে থাকে তবে তা এইজন্য নয় যে ইউরোপের লোকেরা সেই মূঢ়তা থেকে মুক্ত হয়েছে যে-মূঢ়তা সম্প্রদায়ের ধর্মকেই মানুষের ধর্ম ব'লে জানে। বরঞ্চ তার কারণ সেখানে রিলিজনই অনেকের মন থেকে দূরে স'রে গেছে। ধর্ম-শাস্ত্রে অন্ধ বিশ্বাস এখনও কোথাও-কোথাও রয়েছে, এমন-কি আনুষ্ঠানিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও চলছে, তবু মোটামুটি বলা যায় যে ইউরোপীয় মনের, অনন্ত পরিশীলিত মনের, প্রবণতা ধর্মক্ষয়ের দিকেই। এ-প্রসঙ্গে ফ্রান্সে জীবনবাদ (atheistic existentialist) ও মার্ক্সবাদ এবং ইঙ্গ-মার্কিনী দেশসমূহে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্ছেদকামী পজিটিভিস্ট ও এম্পিরিসিস্ট দর্শনের মানসিক আধিপত্য লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্যের পক্ষে এটাই হয়তো অগ্রগতির পথ। কিন্তু ঠিক সেই পথে আমরাও এগিয়ে চলবো এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। ভারতীয় মনের অন্তরতম স্তরে রয়েছে এমন এক আধ্যাত্মিকতার আমেজ যাকে মুছে ফেলা আমার মতে সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকা ইতিমধ্যে নগণ্য হ'য়ে এসেছে। সামাজিক জীবনেও দ্রুত হ্রাস পাবে ব'লে আশা করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মের কোনো স্থান থাকবে না যে-দিন সে-দিনের জন্য আমি খুব আগ্রহান্বিত নই।

ধর্মের অবক্ষয় আমি চাই না তবে ধর্মসম্প্রদায়ের অবসান অবশ্যই কামনা করি। হোয়াইটহেডের সংজ্ঞানুযায়ী : "Religion is what the individual does with his own solitariness." সেই নিভৃত ধর্মের আসন পাতা থাক আমাদের মনে-মনে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের দেশজোড়া আসনটি গুটিয়ে নেবার দিন এসেছে। ক্যান্টওয়েল স্মিথ ঠিকই বলেছেন, "ভারতবর্ষে সেকুলারিজম্ হয় দানা বাঁধবেই না, নয়তো নতুন কোনো রূপে নিজেকে প্রকাশ করবে।" আমার মতে সেই নতুন রূপটি দেখা দেবে যখন আমরা ধর্মকে ধর্মসম্প্রদায়কে থেকে পৃথক ক'রে বুঝবে শিখবো; উপলব্ধি করতে পারবো যে আধ্যাত্মিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরস্পর-ব্যতিরেকী।

ধর্মসম্প্রদায় গঠন করবার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল একদিন। পৃথিবীর প্রায় সবক'টি প্রধান ধর্মের আদি প্রতিষ্ঠাতারা (হিন্দুধর্ম এ-দিক দিয়ে ব্যতিক্রম) একপ্রকার বিপ্লবী শক্তিরূপেই দেখা দিয়েছিলেন; তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন চলিত মতবিশ্বাস, নীতিবোধ, প্রথাপদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। কাজেই তাঁদের প্রথম ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যবর্গকে নিতান্ত আত্মরক্ষার গরজে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হয়েছিলো। তেমন সংগঠিত আত্মরক্ষার প্রয়োজন আজ আর নেই। ধর্মের ব্যাপারে নতুন কথা বলতে যাঁরা আসেন তাঁরা শ্রদ্ধা, উপেক্ষা বা পরিহাস-ভাজন হ'তে পারেন। কিন্তু তাঁদের একেবারে সমূলে উৎপাটন করার জন্য আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্র হিংস্র হ'য়ে ওঠে না।

প্রাচীন যুগে ধর্মের সঙ্গী রাজনীতি অনিবার্যভাবে জড়িত ছিলো। রাজনীতির প্রকৃত কর্মক্ষেত্র সমাজের সুষ্ঠু গঠন ও উন্নয়ন; ধর্মের ক্ষেত্র মনের সৌষ্ঠব ও শান্তি। আজ যখন সর্বত্রই কর্মবিভাগের আবশ্যকতা মেনে নেওয়া হয়েছে তখন এটুকু বুঝতে বাধা কেন যে, মানব-জীবনের সবচেয়ে গুরুতর দুই ক্ষেত্রেও সীমারেখা অস্পষ্ট রাখলে উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আজও রয়েছে, কিন্তু সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা ও বিবর্তনের দায়িত্ব এখন সেকুলার নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মসংস্থা আজ নিষ্প্রয়োজন; শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, এক মস্ত বড়ো অন্তরায়। জাতীয় জীবনে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের অন্তরায় তো বটেই, ধর্মসাধনার পথেও ধর্মসম্প্রদায়ের দুর্মর অস্তিত্ব রীতিমতো একটি বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাববার কোনো কারণ নেই চোদ্দশো, হাজার বা তিন-হাজার বৎসর পূর্বে ধর্মসাধকরা যে-স্তরে উঠেছিলেন সেখান থেকে শুধু নাবাই সম্ভব, অবনতিই

অনিবার্য— যদি-না আমরা সেই দূর অতীতকালের খুঁটি আঁকড়ে আধ্যাত্মিক অধঃপাত থেকে নিজেকে কোনোমতে রক্ষা ক'রে চলি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাবতীয় বিভাগ যখন এগিয়ে চলেছে, নতুন-নতুন পথ খুঁজে বার করেছে, তখন কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো যে, অধ্যাত্মসাধনার বেলাতেই কেবল আমাদের অভিব্যক্তির সকল সম্ভাবনা ফুরিয়ে গেছে, কোনো-এক অতীত যুগের মন্ত্র আউড়ে আমরা পাথর হ'য়ে গেছি; চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছি?

পান্থ তুমি পান্থজনের সখা
পথে চলা, সেই তো তোমায় পাওয়া।

কিন্তু এ-পথ একলা পথিকের। বিজ্ঞানের উন্নতি হয় বহু সাধকের মিলিত চেষ্টায়, লক্ষ-লক্ষ মানুষের কর্মশক্তি যুক্ত হ'লে তবেই সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে; কিন্তু ভগবানের আসন হৃদয়ের গোপন কক্ষেই।

ধর্মসম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রকৃত সন্ধানী কিছুই পেতে পারেন না। যাঁদের অন্তরে সাধনা নেই অথচ মুখে ধর্মের বুলি আছে, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পান গোঁড়ামি আর আনুষ্ঠানিক আচার। অথচ এই দুই প্রকাণ্ড বেড়া ভাঙতে না-পারলে ধর্মের পথে এক পা-ও এগুনো সম্ভব নয়। ধর্মের মধ্যে হয়তো কিছু শাশ্বত সত্য আছে, কিন্তু নিত্য নতুন ক'রে তাকে পেতে হবে, যুগে-যুগে জনে-জনে নব-নব আধারে তাকে ধরতে হবে। ধর্ম শুধু কয়েকটি বুলি নয় যা তোতা পাখির মতো শিখে ফেলা যায়, কসরৎমাত্র নয় যা কয়েক মাসে ডন-বৈঠকের মতো অভ্যাস ক'রে নেওয়া যায়। বহু বৎসরের ব্যাকুল হতাশ অন্বেষণের পর হয়তো পথের ক্ষীণ আভাস দেখতে পাওয়া যাবে। তবু প্রত্যেককে এই আত্মিক অন্ধকারে ক্ষতবিক্ষত চরণে একাই চলতে হবে। দেড় হাজার দু-হাজার বৎসর পূর্বে কোনো মহাত্মা বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন বা গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন ব'লে আমাদের মতো ক্ষুদ্রাত্মা-মাত্রের পথ চলা শেষ হ'য়ে যায়নি। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান সাধক ব'লে গেছেন : "বৈচিত্র্য তো থাকবেই কারণ বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ। আমি প্রার্থনা করি সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ুক, শেষ পর্যন্ত যতজন মানুষ ততগুলি সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠুক এবং প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ধর্মচিন্তা ও সাধনাপদ্ধতি তৈরি হোক্।" সকল সত্যসাধকের অভিজ্ঞতাই অনুরূপ— মুসলিম সুফীদের, ক্রিশ্চান মিষ্টিকদের এবং হিন্দু যোগীদের।

আমি জানি যাঁরা ধর্মের মধ্যে শাস্ত্র-বিশ্বাস আর আচার পালনকেই বড়ো ক'রে দেখেন তাঁদের কাছে স্বামিজীর উক্ত অভিজ্ঞতার মূল্য অল্পই। এইসব লোকের নির্মম ধর্মান্ধতা বহু মহান সাধককে হত্যা করেছে অতীতকালে। কিন্তু আজ ধর্মসম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করার প্রস্তাবে সবচেয়ে প্রবল বাধা ধার্মিকদের কাছ থেকে আসবে না, আসবে রাজনৈতিকদের কাছ থেকে, সেইসব ক্ষমতালোলুপ নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যাঁরা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রাজনীতির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত।

গোঁড়ামী আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে এবং পরস্পরকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। দুটোরই মূলে রয়েছে ধর্মশিক্ষাদানের অতিশয় ভ্রান্ত চিরাচরিত প্রথা। শিশুবয়সে যখন ভালোমন্দ সত্যাসত্য বিচার করবার মতো চিৎশক্তি আদৌ তৈরি হয়নি, তখনই আমরা সম্প্রদায়-বিশেষের কতকগুলি অবোধ্য শাস্ত্রবাক্য বা ডগ্‌মা মুখস্থ করাই, কতকগুলি অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান অভ্যাস করাই। তার চেয়েও যেটা সাংঘাতিক, ভিন্ন মত, আচার ও অনুষ্ঠানের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞার ভাব আমরা সেই কাঁচা বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের মনে পাকা করিয়ে রাখি। সব দেশেই এটা কুশিক্ষা, কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে— যাকে আমরা বহু দূরদেশাগত মত ও পথের ত্রিবেণীসঙ্গম ব'লে গর্ববোধ করি— এ-কুশিক্ষার অনিষ্টকারিতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

আমার বিবেচনায় সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের অভিঘাত থেকে শিশুমনকে সযত্নে রক্ষা করা দরকার। ধর্মের সর্বজনীন ও মূল ভাবখানা (মানব-প্রেম এবং অনন্ত বিশ্বের প্রতি গভীর রহস্যবোধ) তারা অবশ্য গ্রহণ করতে পারে শ্রেষ্ঠ শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত থেকে, কিন্তু ইস্কুলে বা তৎপূর্বে এমন-কোনো ধর্মমত বা আচার শেখানো উচিত নয় যা তাদের বুদ্ধির অগম্য বা যা তাদের মনে সেই বয়স থেকে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ভিত তৈরি করতে পারে। অবশ্য যদি ঘরে বা বাইরে কোনো ধর্মকথা শুনে অথবা ধর্মাচার লক্ষ ক'রে ছেলেমেয়েদের মনে সে-বিষয়ে কৌতূহল জাগে তবে সে-কৌতূহল নিবৃত্ত করাই ভালো, কিন্তু পিতা-মাতা বা শিক্ষকেরা যা বলবেন তা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বলার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। প্রাপ্ত-বয়সে অর্থাৎ ইস্কুল শেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীরা যখন কলেজে প্রবেশ করবে তখনই ধর্মশিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তখন প্রধান-প্রধান সব ধর্মেরই মূল কথা এবং সেই কথাগুলির মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য দুই-ই তাদের সামনে তুলে ধরা দরকার; আদিম বর্বরাবস্থা থেকে ধর্মভাব ও চিন্তা কোন্ পথে এগিয়ে গেছে আর কোথায়-বা অতি প্রাচীন কুসংস্কারে আটকে প'ড়ে আছে, তা-ও তাদের বোঝানো উচিত।

কেউ-কেউ হয়তো এখানে প্রশ্ন করবেন— শৈশবেই যখন নানা-প্রকার ঐহিক বিদ্যা শেখাতে আমাদের আপত্তি নেই তখন ধর্মশিক্ষাদানই বা ঐ-বয়স থেকে আরম্ভ করবো না কেন? উত্তরে বলবো, ছোটোদের শিক্ষা-ব্যাপারে আমরা দুটি নীতি মেনে চলি— এমন-কিছু শেখাই না যা তাদের বুদ্ধিগম্য নয় অথবা যে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও গুরুতর মতভেদ রয়েছে। ধর্মশিক্ষার বেলা এই সর্বসম্মত নীতিদ্বয় লঙ্ঘন করার কোনো কারণ দেখি না।

গড্, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আল্লা ইত্যাদি শব্দ শুনলে আমাদের মনে কী ধারণা বা প্রত্যয় জন্মায়? ওল্ড্ টেস্টামেন্টে যে-ইয়েহোভার কথা আছে তিনি এক সর্বশক্তিমান রাজাধিরাজ যাঁর বজ্রকঠিন করুণাময় পিতাকে যিনি পাপী-তাপীর দিকে স্নেহার্দ্র ক্ষমায় হাত বাড়িয়ে আছেন;

উপনিষদে যে পরম-একের কথা বলা হয়েছে তিনি সকল ভাবনা ও ধারণার অতীত, নির্গুণ ও নিরুপাধিক; অথবা ঈশ্বর কি এক চিরদুর্ভেদ্য অনন্ত রহস্যেরই নাম, নাকি আমাদেরই মনের মধ্যে অধরা সুন্দরের, অসাধ্য শ্রেয়সের ভাবচ্ছবি? পাপ-পুণ্য কি জাগতিক কর্মফলপ্রসূ, অথবা এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান বিচারপতির নিকট যথোপযুক্ত শাস্তি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হয়! এ-সব প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিশারদরা একমত নন, এবং এর কিছুই ছোটো ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। ধর্মের মধ্যে যা-কিছু সত্য ও মহান তা গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ আজীব সাধনা-সাপেক্ষ। যখন দেখি যে আমাদের শাস্ত্রনিষ্ঠ ও আচারবদ্ধ ধার্মিকরা মনে করেন ধর্মশিক্ষা কেবল ধরতাই বুলি মুখস্থ এবং চিরাচরিত আচার অভ্যাস করানোর ব্যাপার আর তা অল্প বয়সেই বেশ সুসম্পন্ন হ'তে পারে, তখন সত্যধর্মের প্রতি তাঁদের এই গভীর অশ্রদ্ধা আমাকে অবাক করে।

উপসংহারে আরও-একটি ব্যাপারে আমার বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করি। ভারতবর্ষের মতো দেশে— যেখানে ধর্মের বালভাষিত স্ফূরণ থেকে মহীয়ান পরিণতি পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর আমাদের চোখের সামনে, উদ্ঘাটিত, যেখানে সবক'টি মুখ্য ধর্মের লক্ষ-লক্ষ প্রতিনিধির সঙ্গে আমরা দেশাত্মবোধের সূত্রে বদ্ধ, যেখানে এই বিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, শ্রীঅরবিন্দ, রমণ মহর্ষি ও সুফী সফীউল্লার মতো ব্যক্তিত্বে ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, এবং যারা ছোরা বোমা ও পেট্রল হাতে আর আল্লাহু আকবর কিংবা বন্দে মাতরমের জিগির মুখে মনুষ্যত্বের হানি ঘটায় তাদের মধ্যে ধর্মের জঘন্যতম রূপ খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ উপস্থিত— সেখানে প্রধান-প্রধান ধর্মসমূহের গতিপ্রগতি ইতিহাস মনস্তত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে শিক্ষালাভের কোনো সুব্যবস্থা নেই। আমরা হিন্দুধর্মচর্চা করতে পারি কাশীতে, ইসলাম দেওবন্দে, আদানপ্রদান ঘাতপ্রতিঘাত সমন্বয় ও বিরোধ বিষয়ে অনুসন্ধান করবো কোথায়? মানুষের মন বুঝতে হ'লে (একই সমাজে একই রাষ্ট্রে সার্থক সহযোগিতায় বাস করতে গেলে বুঝতে হবে বৈ-কি) যা তাদের দেবতুল্য এবং পশুর অধম ক'রে তোলে— অর্থাৎ তাদের ধর্মচিন্তা, আচার ও অনুভূতি— সে-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধে আমরা অল্প-অল্প যদি-বা কিছু জানি, অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা নিটোল, সুতরাং অবজ্ঞা নিরেট। শিক্ষার এই সর্বজনীন অভাব দূর হবে তখনই যখন আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চেষ্টার সঙ্গে সরকারি চেষ্টাও যোগ দেবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের (comparative religion-এর) পুরোদস্তুর এক-একটি বিভাগ কেন্দ্রাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অচিরে স্থাপিত হোক, পরে অন্য-সব বিশ্ববিদ্যালয়ও সে-দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ ও কর্মতৎপর হবে আশা করা যেতে পারে।